দশকুমার চরিতে

রাজবাহনচরিতম্

(দণ্ডি প্রণীতম্)

(দণ্ডীর পরিচয় ও কাল, রচনাশৈলী, গ্রন্থপরিচয়, মূলসংস্কৃত, বাংলা প্রতিশব্দ, সংস্কৃত প্রতিশব্দ, বঙ্গার্থ, ইংরাজী অনুবাদ, সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাখ্যা, টীকা, ব্যাকরণ, সংস্কৃতে সংক্ষিপ্তোত্তর ও পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্বলিত।)

অবাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের মূলপাঠটি পড়ার সুবিধার জন্য
নাগরীলিপিতেও মূলপাঠ দেওয়া হয়েছে।
নাগরীলিপি কিন্তু সংস্কৃতলিপি নয়।

শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রতিবেদন

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যভাণ্ডারের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন মহাকবি দণ্ডীর 'দশকুমার চরিতম্' কাব্যখানি। তারই মূল অংশের প্রথম উচ্ছ্বাস 'রাজবাহনচরিতম্' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পাস ও অনার্সের পাঠক্রমে বহুদিন যাবৎ নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকস্তরে সংস্কৃত যতদিন অবশ্যপাঠ্য ছিল, ততদিন মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর যেমন প্রাচুর্য ছিল, সেরূপ পাঠ্যপুস্তকও সুলভ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃত বিষয়ের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান নীতি লক্ষণীয় ভাবে বিস্তার লাভ করায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহা জন্মান স্বাভাবিক। তার ফলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতবিষয়ের চতুষ্পাঠী বিভাগ থেকে শুরু করে গবেষণাস্তর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক পাওয়া দুরুহ ব্যাপার। সংস্কৃতপুস্তকের এমন দুর্যোগসংকুল পরিস্থিতিতে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অবদান ও প্রচেষ্টা বিরল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁর প্রেরণায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতের স্নাতক বিভাগের পাঠক্রমের অন্যান্য বই-এর সঙ্গে এই 'রাজবাহনচরিত'টিও ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এই পুস্তকটির গুণগত উৎকর্ষ তথা ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ থাকছে।

☞ প্রথমতঃ, গ্রন্থটির সূচনাপর্বেই কবির ব্যক্তিপরিচয় থেকে আরম্ভ করে কবি ও কাব্যবিষয়ে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।

☞ দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ. পর্যন্ত বাংলা ভাষায় উত্তর দান অনুমোদন করায় বাংলা ভাষাতেই বিষয়গুলি রচনা করা হয়েছে।

☞ তৃতীয়তঃ অনার্সে একটি ব্যাখ্যা 'সংস্কৃত' ভাষায় লেখার নির্দেশ থাকে, সে অভাবটিও পূরণ করার জন্য ব্যাখ্যাগুলি দুটি ভাষাতেই দেওয়া হয়েছে। তার উপর প্রতিটি অনুচ্ছেদের বাংলা অর্থ দেওয়া আছে বলে শব্দার্থের ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে এর দ্বারা অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হবে।

☞ চতুর্থতঃ ব্যাকরণ অংশ ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশের যথাযথ আলোচনা আছে।

☞ পঞ্চমতঃ, উক্ত গ্রন্থের প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তর শেষভাগে দেওয়া হয়েছে।

☞ ষষ্ঠতঃ; অপ্রয়োজনীয় কোনরূপ আলোচনা যুক্ত করে পুস্তকের কলেবর ও মূল্যবৃদ্ধির করার অপচেষ্টা নাই।

সপ্তমতঃ বিদ্যালয়স্তরে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য না থাকার ফলে ছাত্রদের নাগরী হরফ পড়ার জড়তা ও অনীহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাছাড়াও বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে বাংলা হরফ অপেক্ষা অন্য কোন হরফই সুখপাঠ্য হয় না। এ প্রসঙ্গে আরও বলতে হয় যে, 'নাগরী' হরফটি 'সংস্কৃত হরফ' নয় — চিরকাল লেখকগণ নিজ নিজ অঞ্চলের হরফে সংস্কৃত লিখে এসেছেন। বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে বাঙালী পণ্ডিতবর্গের সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় রচনা বাংলা হরফেই হ'য়েছে।

আমাদের দেশে বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র, বিংশ সংহিতা, অষ্টাবিংশতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গলিপিতেই এখন পর্যন্ত মুদ্রিত হয়ে থাকে এবং সে সমস্ত গ্রন্থপাঠ করে বর্তমানের হিন্দীলিপিতে পড়া ছাত্র অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের থেকে কোন অংশে ন্যূন হল না। আরও স্মরণীয় যে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে অবিভক্ত বাংলায় বাংলা হরফে যত সংখ্যক প্রামাণ্য গ্রন্থ বাংলা হরফে প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে নাগরী হরফে তার ৩/৪ অংশ প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। সেই আদর্শেই সমগ্র পুস্তকটি বাংলা হরফে মুদ্রিত হ'লো।

আশা করি, মাননীয় অধ্যাপক-অধ্যপিকাবর্গ কেবল বাংলা হরফের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পুস্তকটি বর্জন না করে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিচারপূর্বক গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন।

পুস্তকটির সম্পাদনা ও প্রকাশনার জন্য শ্যামাপদবাবুকে ধন্যবাদ জানাবার সঙ্গে তদীয় পুত্র শ্রীমান দেবাশিস্ ভট্টাচার্য্যকে প্রীতি-শুভেচ্ছা না জানালে প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

জন্মাষ্টমী

১৩৯৮

— অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন

দেবনাগরী হরফের ক্রমাগত দাবি মেটাবার জন্য বাংলা হরফের সঙ্গে দেবনাগরী হরফ সংযুক্ত করা হলো। সেইসঙ্গে এবারে ইংরাজী অনুবাদ এবং গত পাঁচ বছরের পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হলো নূতন সংযোজন হিসাবে। আশা করি এই সংযোজনগুলির দ্বারা পুস্তকটির আরও কিছু উৎকর্ষ বাড়বে।

— অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাসযাত্রা

১৪১৩

প্রস্তাবনা

সংস্কৃত গদ্যকাব্য-বিকাশ

সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ে গদ্যসাহিত্যের প্রাচীনতা সম্পর্কে যথেষ্ট মর্যাদা প্রদর্শন করেও উল্লেখ করতে হয় যে, পদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে গদ্যেরও বহু আগে। এমনকি যেটি পৃথিবীর প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডার বলে পরিগণিত সেই ভারতীয় আদিসাহিত্য ঋগ্বেদও পদ্যে রচিত। তবে বৈদিক যুগেই গদ্যের তেমন বিকাশ না হলেও প্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে, উপনিষৎ গ্রন্থ সমূহে, যাস্কের নিরুক্তে গদ্যের যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। তারপর উল্লেখ্য শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছটি বেদাঙ্গ গ্রন্থের মধ্যে গদ্যের যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ আছে। পুরাণেতিহাসের যুগেও গদ্য সম্পূর্ণ রূপে বর্জিত হয়নি মহাভারতে, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের বহু স্থানে গদ্য রচনা আছে।

এরপর গদ্য সাহিত্যের বিকাশে যেগুলির ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হলো ভাষ্যগ্রন্থ, যেমন **পতঞ্জলির মহাভাষ্য**। মহাভাষ্যের রচনারীতি অত্যন্ত সহজ, সরল সাবলীল। এটি ব্যাকরণশাস্ত্রের তত্ত্বমূলক গ্রন্থ হলেও রচনারীতিবৈশিষ্ট্যে সুখপাঠ্য গদ্যের উন্নত নিদর্শন।

সায়নাচার্যের বেদভাষ্য। বেদের জটিল সূক্ষ্ম অর্থগুলি সায়নাচার্য সরল সংস্কৃত গদ্যে প্রকাশ করেছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সংস্কৃত গদ্যের প্রভূত বিকাশ ঘটেছে। যেমন **শবরস্বামীর কর্মমীমাংসা, শংকরাচার্যের, রামানুজাচার্যের ও বল্লভাচার্যের লেখা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য** সমূহ গদ্যেই রচিত। বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের যাবতীয় ভাষ্য সংস্কৃত গদ্যের উত্তম নিদর্শন।

কিন্তু এরপর গদ্য থেকে এসে যায় গদ্য কাব্যের কথা। গ্রন্থরাজী সংস্কৃত গদ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হলেও এগুলিকে গদ্যকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এসমস্ত গদ্য থেকে গদ্য কাব্যের বিলক্ষণ ভেদ আছে। গদ্যকাব্য- সাহিত্যে গদ্যের মধ্যে থাকে গাঢ়পদবন্ধ, অলঙ্কারের পারিপাট্য এবং ব্যক্তি, প্রকৃতি প্রভৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনা। বিশ্বনাথ কবিরাজ অতিসংক্ষেপে গদ্যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন,—'বৃত্তগন্ধোজ্‌ঝিতংগদ্যম্'। অতএব গদ্যকাব্য সম্পর্কে বিভিন্ন অলংকারিকদের সিদ্ধান্তও ভিন্ন ভিন্ন যেমন আচার্যদণ্ডী বললেন—'অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যমাখ্যায়িকা কথা। কাব্যদর্শ ১।২৩ অর্থাৎ ছন্দোবন্ধহীন পদসমষ্টিকেই গদ্যকাব্য বলে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মত পূর্বেই বলা হয়েছে।

এই সূত্র ধরে কেউ কেউ কতকগুলি শিলালেখকে গদ্যকাব্যের পর্যায় ভুক্ত করার পক্ষপাতী যেমন **রুদ্রদামনের প্রশস্তিগিরণার শিলালেখ** ও **হরিষেণ** রচিত **সমুদ্রগুপ্তের**

প্রশস্তি এলাহাবাদ শিলালেখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে এদুটির মধ্যে কিছুমাত্রায় কাব্যশৈলী থাকলেও এগুলিকে কখনই পুরোপুরি গদ্যকাব্য হিসাবে উপস্থাপিত করা যায় না।

আশ্চর্যের বিষয় অষ্টমশতাব্দীর আলঙ্কারিক আচার্য বামন তাঁর কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তির বৃত্তিতে বলেছেন, **'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি'** অর্থাৎ গদ্যই কবিদের কষ্টি পাথর। সোনার যথার্থতা যেমন কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে নিরূপণ করা হয়, তেমন গদ্য রচনা দৃষ্টেই কবির কবিত্ব পরীক্ষিত ও নিরূপিত হয়। সেই গদ্য কাব্য কিন্তু সংস্কৃত কাব্য ভাণ্ডারে অত্যন্ত অপ্রতুল। সংস্কৃত কাব্যজগতে যাঁরা সমস্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন সেই কালিদাস, **মাঘ, ভারবি** প্রমুখ কবিগণ কিন্তু গদ্য রচনা করলেন না। এর একটিই সম্ভাব্য কারণ বলা যায়, সামাজিকদের রুচির উপর নির্ভর করেই সাহিত্য বিকশিত হয়। সামাজিকদের রুচিকে মর্যাদা না দিয়ে অগ্রাহ্য করে নিজের রুচিতে সাহিত্য সৃষ্টি করলে সে সাহিত্য সমাজে স্থান পাবে না। তাই সব ভাষাতেই এক এক যুগে এক এক জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

যাইহোক গদ্যকাব্যের প্রাচুর্য ও প্রাচীনতা পদ্য কাব্যের সমতুল্য না হলেও একেবারে অর্বাচীন বলা যায় না। কারণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি **বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভৈমরথী** তিনখানি গদ্য কাব্যের নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং এগুলি যে পতঞ্জলির আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। মহাকবি বাণভট্টও কবি প্রশস্তিতে **ভট্টার-হরিচন্দ্র, আঢ্যরাজ, রোমিল, সৌমিল্ল** প্রভৃতি কবিদের নামগুলি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যেমন—

'পদবন্ধোজ্জ্বলা হারী কৃতবর্ণক্রমস্থিতিঃ।
ভট্টার হরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধ নৃপায়তে।'
'আঢ্যরাজকৃতোৎসাহৈ র্হৃদয়স্থৈঃ স্মৃতৈরপি।
জিহ্বাস্তকৃষ্যমাণেব ন কবিত্বে প্রবর্ততে।।'
'তৌ শূদ্রককথাকারৌ রম্যৌ রামিল সৌমিলৌ।
যয়োর্দ্বয়োঃ কাব্যমাসীদর্ধনারীশ্বরোপমম্।।'

এখানে কবির নাম পাওয়া গেলেও ভট্টার হরিচন্দ্র ও আঢ্যরাজের রচনার নাম আমাদের অজ্ঞাতই থেকে গেছে। রামিল ও সৌমিল দুজনেরই রচনার নাম **শূদ্রক কথা** বলে অনুমান করা যায়। দুজনের রচনার প্রশস্তিবাক্য পড়ে মনে হয় একটি গ্রন্থ আরেকটির পরিপূরক ছিল।

ধনপালের তিলকমঞ্জরীর নাম পাওয়া যায়; আবার তাঁর উক্তি থেকে **তরঙ্গ বতী'** নামে একটি কথাকাব্যের নাম পাওয়া যায়।

'পুণ্যাপুনাতি গঙ্গেব গান্তরঙ্গবতী কথা'। এই তরঙ্গবতী কাব্যটি সম্ভবতঃ শিবপাল

রচিত। **ধনপালের** আর একটি গদ্যকাব্যের নাম পাওয়া যায়— 'ত্রৈলোক্যসুন্দরী'। **জল্হনের সূক্তি রত্নাবলীতে** মহিলা কবি **শীলা ভট্টারিকার** নাম পাওয়া যায় এবং সেই সূত্রেই জানা যায় তিনি এককালে গদ্যকাব্য রচনায় প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

'শব্দার্থয়োঃ সমোগুম্ফো পাঞ্চালীরীতিরিষ্যতে।
শীলাভট্টারিকা বাচি বাণোক্তিষু চ সা যদি।।'

তিনি যে পাঞ্চালীরীতিতে সামাজিক-হৃদয় জয় করেছিলেন, এই উক্তিটিই তার প্রমাণ।

এখন কথা হলো এসমস্ত কাব্য ও কবির নামই কেবল বিভিন্নস্থান থেকে পাওয়া যাচ্ছে; দীর্ঘকাল যাবৎই এসমস্ত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচরীভূত হয় না। তাহলে কি এসমস্ত উক্তি যথার্থ নয়? ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে অতিস্বল্প ধারণা থাকলেও এরূপ সন্দেহ পোষণ করা যায় না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, রাজনৈতিক কারণে, বৈদেশিক আক্রমণে, ধর্ম বিপ্লবে-প্রভৃতি নানাকারণে আমাদের বহুসাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য—লুণ্ঠন, ধ্বংস প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় আমাদের হস্তচ্যুত হয়েছে। এগুলি আজ উপলব্ধ না হলেও একসময় ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

বর্তমানে সংস্কৃত প্রাচীন গদ্যকাব্য মাত্র চারটি গ্রন্থ উপলব্ধ। এই চারটি গ্রন্থ হলো **সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিত** এবং **দণ্ডীর দশকুমার চরিত**।

প্রথমেই **সুবন্ধুর** নাম উল্লেখ্য। কবিবাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে কবি প্রশস্তিতে একটি শ্লোকে বলেছেন,—

'কবিনামগলদ্দর্পোনূনং বাসবদত্তয়া।
শক্ত্যেব পাণ্ডু পুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্।।'

যদিও এখানে কবির নামের উল্লেখ না থাকলেও বাণের পূর্ববর্তী গদ্যকাব্য রচয়িতা সুবন্ধুরই কাব্যের প্রশংসা করেছেন বলে অধিকাংশের মত। আর সুবন্ধু যে বাণের পূর্ববর্তী ছিলেন, তার প্রমাম রেখে গেছেন সুবন্ধু তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাংশের একটি শ্লোকে। তিনি বিক্রমাদিত্যের অভাবে কবিদের দুর্দশা অনুমান করে লিখেছেন,

'সা রসবতা বিহতা নবকা বিলসন্তি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্তিশেষং গতবতি ভূবি বিক্রমাদিত্যে'।।

এই উক্তি থেকে তাঁকে চতুর্থশতকের কবি মনে করা হ'লেও তিনি আর একটি উক্তিতে উদ্যোৎকার এবং ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত ধর্মকীর্তির নাম উল্লেখ করায় তাঁকে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের কবি বলে অনুমান করা হয়।

সুবন্ধুর বাসবদত্তা **'প্রত্যক্ষর শ্লেষময়'** কাব্য বলে বিখ্যাত। বাসবদত্তা নামক কথা কাব্যটি নির্জীব ও সুবন্ধুর কল্পনা কল্পিত কাহিনী। এরমধ্যে কিছু লৌকিক প্রসিদ্ধির

উল্লেখ আছে। যেমন—

১) নায়ক নায়িকার পরস্পর স্বপ্নদর্শন এবং জাগরণের পর পরস্পরের প্রণয় সৃষ্টি।

২) নায়ক নায়িকার মিলনে শুকপক্ষীর সহায়তা।

৩) নায়ক নায়িকার মনের মত বেগশালী অশ্বে করে পলায়ন।

৪) অভিশাপে বাসবদত্তার প্রস্তরীভবন।

৫) আকাশবাণী শুনে আত্মহত্যা করতে উদ্যত নায়কের আত্মহত্যা না করা।

বাসবদত্তা কাব্যটি সংক্ষিপ্ত হলেও সবন্ধু বর্ণনা চাতুর্যে চমৎকারিত্ব, শ্লেষের প্রাচুর্য এবং বক্রোক্তির সন্নিবেশ দেখা যায়। কবি নিজেই বলেছেন—

'সুশ্লেষবক্রঘটনা পটু সৎকাব্য বিরচনামিব'।

সুবন্ধুর গদ্যশৈলীতে অতিশয়োক্তির আধিক্য, সমাসবাহুল্য ও গৌড়ীয়ারীতি লক্ষিত হয়। তবে তৎকালে সুবন্ধু খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন। ভট্টবামন বলেছেন,

প্রতীকাবভেদনবাণঃ কবিতারুগহনবিহরণ ময়ূরঃ।
সহৃদয়লোকসুবন্ধুর্জয়তি শ্রীভট্টবাণ কবিরাজঃ।।

সুবন্ধুর পর উল্লেখ্য গদ্যকাব্যকার হলেন **মহাকবি বাণভট্ট**। তাঁর দুখানি গদ্যকাব্য-গ্রন্থ গদ্যকাব্যের প্রধান দুটি ভাগের দুটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কথাকাব্যের নিদর্শন তাঁর **কাদম্বরী** আর আখ্যায়িকার নিদর্শন **হর্ষচরিতম্**। তবে মহাকবি, কাদম্বরী কাব্যখানি অপূর্ণরেখেই স্বর্গত হয়েছিলেন। শেষাংশ তাঁর কৃতীপুত্র ভূষণভট্ট রচনা করে গ্রন্থটি পূর্ণ করেছেন। তিনি উত্তরার্ধের প্রথমেই লিখেছেন—

যাতে দিবং পিতরি তদ্বচসৈব সার্ধং
বিচ্ছেদামপি ভুবি যস্তু কথা প্রবন্ধঃ।
দুঃখং সতাং তদসমাপ্তিকৃতং বিলোক্য
প্রারব্ধ এব ময়া ন কবিত্ব দর্পাৎ।।

তাঁর হর্ষচরিত কাব্যটিও অসমাপ্ত। এ গ্রন্থটি অসমাপ্ত থাকার কারণ এখন আর নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

কবির কাদম্বরীর উৎকর্ষও প্রসিদ্ধি সমধিক। কাদম্বরীর মধ্যে কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য— ১) কাদম্বরীতে শুকপাখী সর্বশাস্ত্র বিশারদ এবং মানুষের ভাষায় কথা বলে।

২) মহাত্মা জাবালী ছিলেন ত্রিকালদর্শী,

৩) কিন্নরেরা হিমালয়ে স্বর্গীয় বাতাবরণে বাস করেন।

৪) কাদম্বরী কাব্যের পাত্রগণ অবাধগতি সম্পন্ন;তাঁরা চন্দ্রলোকে, গন্ধর্বলোকে, মর্ত্যলোকে— সর্বত্র বিচরণ করেন।

৫) কাদম্বরীতে আখ্যান অপেক্ষা বর্ণনা বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষণীয়। নগর, উদ্যান, রাজপথ, অন্তঃপুর, দোকান-প্রভৃতি সবকিছুর নিখুঁত ভাষাচিত্র অঙ্কনে বাণভট্ট অতুলনীয়।

কাদম্বরীর বাক্য সাধারণতঃ সমাস বহুল ও দীর্ঘ, তথাপি মহাকবি তাঁর নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্নরাখতে একটি বা দুটি দীর্ঘ বাক্যের মধ্যে সমাসহীন লঘুবাক্য প্রয়োগ করেছেন। কাদম্বরী শব্দের অর্থানুসারেই যেন শব্দচয়ন করা হয়েছে। বসন্তবর্ণনায় কবি সমস্ত সুকুমার বর্ণগুলি প্রয়োগ করেছেন। যেমন—

'অশোকতরুতানেরমণীমণিনূপুরঝঙ্কারসহস্র মুখরেষু সকলজীবলোক হৃদয়ানন্দদায়কেষু মধুমাসদিবসেষু। ইতি।

কিন্তু বিন্ধ্যপর্বত বর্ণনাকালে বিপরীত— সমাস বহুল বিকট শব্দ সমূহের প্রয়োগ—

'ক্বচিৎ প্রলয়বেলেব মহাবরাহদংষ্ট্রাসৎমুখাতধরণিমণ্ডলা, ক্বচিৎ উন্মত্তমৃগয়তিনাদভীতেব কণ্টকিতা'। ইতি

হর্ষচরিতের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, এখানে কবি নিজের বংশের উৎপত্তির কথা বলে ঐতিহাসিক পুষ্যভূতি বংশের প্রভাকর বর্ধনের কার্যকলাপ তাঁর পুত্রকন্যার জন্ম, বিবাহ, প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যু, হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ, যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি ঘটনাগুলির সন্নিবেশ ঘটিয়ে এটিকে ঐতিহাসিক কাব্যে উন্নীত করেছেন।

এরপর উল্লেখ করতে হয় মহাকবি **দণ্ডীর দশকুমার চরিতের** কথা। দণ্ডীর হাতে গদ্যকাব্য যেন প্রথম এক অভিনব সমৃদ্ধ রূপ লাভ করেছে। তিনিই আখ্যানের মধ্যে চমৎকারিত্বের সঙ্গে গতিদান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাণভট্ট আখ্যান ভাগকে গৌণ করে বর্ণনাকে মুখ্য করে তোলায় আখ্যান ভাগ শ্লথগতিতে অগ্রসর হ'য়েছে। দণ্ডী কিন্তু বিপরীত ধর্মী, তিনি সবসময় গতিময় করেছেন আখ্যান ভাগকে। আর একটি বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃত সাহিত্যে তিনিই প্রথম সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রাকে প্রতিফলিত করেছেন।

সুবন্ধু-বাণ-দণ্ডীর পরও বহুগদ্য কাব্য রচিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য খৃষ্টীয় দশম শতকে **ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী'**, একাদশশতকে **বাদীভসিংহের 'গদ্য চিন্তামণি' ও সেড়ঢলের 'উদয়সুন্দরীকথা'**, পঞ্চদশশতকের প্রথমভাগে রচিত **বর্তমান অগস্ত্যের 'কৃষ্ণচরিত**, সপ্তদশ শতকে **বামনভট্টবাণের বেমভূপাল চরিত**, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে **হৃষীকেশ ভট্টাচার্য রচিত 'প্রবন্ধমঞ্জরী'** ও ঊনবিংশ শতকেই রচিত **অম্বিকাদত্ত ব্যাসের 'শিবরাজবিজয়'**।